উত্তরাধুনিক শরাব

মুসা আল হাফিজ

ঐতিহ্য

কালজ পেয়ালায় কালোত্তর পানীয়

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ওসমান গনী

জীবন-জীবিকার চাপে ভাঙাচুরা কবি হ্যোল্ডারলিন এর একটি কবিতায় পোয়েটিক্যালি ম্যান ডুয়েলস বা ইনসানের কাব্যিক বেঁচে থাকার কথা রয়েছে। একে অসিলা করে কাব্য বা শায়েরির মধ্যে মানুষের জীবনযাপনকে তফসির করেছেন দার্শনিক হাইডেগার সাহেব। হাইডেগারের হিসাবে মানুষের সত্তা প্রকাশিত হয় ভাষার গতরে। একে উসুল বানাতে হ্যোল্ডারলিনের জবানিকে কাজে লাগিয়েছেন হাইডেগার। তার জবানি হলো 'উৎকর্ষে পূর্ণ, তবু শায়েরির বৃত্তে এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস।' হাইডেগার তিনটি দিক খেয়াল করেছেন এই বাক্যের। মানুষের জীবনযাপনকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা : এ জীবন (ক) উৎকর্ষপূর্ণ (খ) শায়েরির বৃত্তে (গ) এই পৃথিবীতে। এই পৃথিবীর সমস্ত বাস্তবতাকে সঙ্গী করে উৎকর্ষপূর্ণ জীবনের ভাষাচিত্র অঙ্কনে শায়েরির বৃত্তের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মুসা আল হাফিজের প্রধান এক বৈশিষ্ট্য। তিনি একই সাথে কবি ও চিন্তক। শায়েরি এবং চিন্তার তখনই প্রকৃত মেলবন্ধন হয়, যখন তারা নিজস্ব হাকিকত (substance) জারি রেখেও নিজেদের মধ্যে জড়ো হয়। কারণ, সবকিছুর এক হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে নয়, বরং প্রাতিস্বিকতার মধ্য দিয়ে, একত্রিত হবার মিলসূত্রেই সত্তার প্রকৃত উন্মোচন সম্ভব।

মুসা আল হাফিজের রচনায় অন্তর্বেদনা, প্রতিবাদ ও প্রকৃতির সাবলীল পরিস্ফুটন লক্ষণীয়। তার অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম বাতেনি (psychic) কথনে আস্থাশীল হলেও জাহেরি জগতের ব্যাপ্তির (Extent of the visible world) সাথে তা একাকার। তার রচনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আধুনিক জীবন উপলব্ধির প্রগাঢ় হেকমত আমাদের স্পর্শ করে। এর পাশাপাশি তাতে থাকে

রুহানিয়ত এবং ইতিহাস ও প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ছাপ। তার রচনায় স্থানিক পরিমণ্ডল ভেদ করে বিশ্বজনীন আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। বিশেষ করে দার্শনিক প্রবচনমূলক রচনায় তিনি অন্তর্গত সত্তার নিরাময় সূত্র সন্ধান করেছেন। এজন্য বৃহত্তর জীবনযাপনকে ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। যাতে মানুষের ভেতর ও বাইরের জগৎ একটি সুস্থতাকে উদ্‌যাপন করতে পারে।

গভীর অর্থবোধক বাক্য, যাকে ইংরেজিতে বলে saying বা proverb, বাংলায় তা প্রবচন হিসেবে মশহুর। এরকম কালাম বা oratory মুসা আল হাফিজের এক পাঠকপ্রিয় জনরা। নক্ষত্রচূর্ণ, বিষগোলাপের বন, হৃদয়াস্ত্র, জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার গ্রন্থ তার এ ধারার স্বীকৃত কাজ। এবার আমরা পাঠ করছি উত্তরাধুনিক শরাব। বস্তুত অন্যান্য কেতাবের মতো এ কেতাবও নিছক প্রবচনে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে অণুগল্প, ম্যাক্সিম, এপিগ্রাম, অণুকাব্য, ছোট কথিকা, আত্মকথন, কল্প-সাক্ষাৎকার ইত্যাদির এক বহুবর্গীয় জমায়েত ঘটেছে। এসব রচনার সুরতে ও প্রকরণে বৈচিত্র্য আছে। তবে কলবে কলবে মিল বা অন্তর্গত যৌথতার (Intrinsic matching) প্রশ্নে রচনাগুলো খুব কাছাকাছি। প্রায় সব রচনাই বুদ্ধির দৃষ্টিশক্তি সরবরাহ করে, চিন্তার জড়তাকে ধাক্কা দেয় এবং উচ্চ মূল্যবোধের অনুপ্রেরণা দেয়।

মানুষের চিন্তাশক্তিকে শানিত করা এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত নজরিয়া বা perspective-কে আলোকসম্পন্ন করা এর উদ্দেশ্য। সাধারণের কাছে যে বিষয়টা নিতান্ত মামুলি, মুসা আল হাফিজ তার উপরেও গভীর চিন্তার ভার আরোপ করেছেন। এসব বচন ও রচনার জীবনাবেদনের গণ্ডি নানা খাতে প্রসারিত, যার মধ্যে চিন্তার সব শাখাই অন্তর্ভুক্ত। জগৎ ও জীবনকে জানতে যেয়ে এবং জগৎ ও জীবনের আড়ালের রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে যেয়ে বিভিন্ন তত্ত্বগত অনুধ্যানের নতিজা (benefit) হচ্ছে তার এসব রচনা। তার জীবনের বিশ্বাস, লক্ষ্য ও আদর্শিকতার সাথে এর গভীর সম্পর্ক। এই বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে মানবজাতি ও প্রকৃতির শিক্ষাসমূহের অন্তর্গত বন্ধনকে তিনি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির লীলাখেলায় নিজের ধ্যান ও বিস্ময়কে প্রকাশ করেছেন। উইল ডুরান্ট লিখেছেন, নিজের জীবন ও মানবজাতির সমন্বিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চিন্তার একটা কাঠামো তৈরি করাই দার্শনিকের কাজ।

উত্তরাধুনিক শরাব গ্রন্থে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথামালার দশটি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে চমকপ্রদ বিষয়। ছোট ছোট কালামগুলো শব্দের চেয়ে বেশি অর্থ প্রকাশে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রথম অধ্যায়ে দশটি গল্প আছে। সবগুলোই

অণুগল্প। এগুলো চরম সংক্ষিপ্ততার এমন কাল্পনিক কাজ, যা সামান্য কিছু কথা বলে অসামান্য মর্মের দুনিয়ায় নিয়ে যায়! দু'-একটি গল্প আবার কল্পনা নয়, ইতিহাসজাত। প্রতিটি গল্পই মনে করিয়ে দেয়– শামুকে লুকিয়ে থাকা ঝিনুক অতি ক্ষুদ্র!

দ্বিতীয় অধ্যায় আড়ালে দৃষ্টিপাত। এখানে ইতিহাসের বিশেষ তিক্ত দিক ও বিতর্ক হেকমতপূর্ণ ইশারায় জাহির হয়েছে। বিশেষত লেখকের কাজের অন্যতম দিক প্রতীচ্যবাদ ও প্রতীচ্যপাঠের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। তিনি এমন কিছু বিষয় সামনে এনেছেন, যাকে যত্ন করে আড়ালে রাখা হয়। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে আত্মগর্বের তলানিতে যেসব অন্ধকার রয়েছে, তারই কিছু চিত্র সংক্ষেপে এখানে পড়া যেতে পারে। বিশেষ করে উন্নয়নের প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষক অণুরচনায় বিশাল এক বিতর্কের খোলাসা আছে। ইতিহাস অন্বেষী সবার জন্যই তা উপকারী। ঠিক তেমনি ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও এর গুরুত্ব রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় দিন-রাতের দুধ ও সর লেখকের আত্মজৈবনিক কথকতা। চিন্তাবিদের জীবনী আসলে চিন্তারই জীবনী হয়ে ওঠে। মুসা আল হাফিজ যখনই নিজের আত্মগাঁথা শুনাতে শুরু করেন, তখন তা চিন্তার সফরের কাহিনি হয়ে ওঠে। মূলত কল্পনা দিয়ে সাজানো এই সফর। কিন্তু এর মধ্যে যে সারবস্তু পাওয়া যায়, তা দৃশ্যমান বাস্তবের চেয়েও শক্তিশালী। এই অধ্যায় লেখকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক যাপনের টুকরা-টাকরা দিয়ে সাজানো। প্রতিটি টুকরা মূল্যবান। লেখাগুলো গভীর মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ও পঙ্‌ক্তি সংক্রামক এবং প্রজ্ঞা-উদ্দীপক।

চতুর্থ অধ্যায় ইতিবৃত্তের অন্তরে। বিভিন্ন মনীষীর প্রজ্ঞাপ্রসূত ইতিবৃত্ত মূলত এখানে রয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মোড়কের ভেতর পরিবেশন করা হয়েছে বিচিত্র শিক্ষা। এসবের অনেকটাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মনোকাঠামোগত। যাদের ইতিবৃত্তে ভর করে মুসা আল হাফিজ ইশারাগুলো দিতে চেয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন অ্যারিস্টটল, ডায়োজেনিস, ভ্যান গগ, গগ্যা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ , আইজ্যাক নিউটন, চার্লস ডিকেন্স, স্টালিন, টমাস আলভা এডিসন ও কাজী নজরুল ইসলাম।

পঞ্চম অধ্যায় দৃশ্য ও রহস্য। এতে প্রকৃতির রহস্যলীলা নানাভাবে বয়ান করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যলোকে ভ্রমণ করলে শুধু দৃশ্যমান সুন্দরই চোখে পড়ে। অভ্যন্তরীণ সুন্দর সবাই দেখতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় আলাদা ইন্দ্রিয়ের। মুসা আল হাফিজ যেন তার স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা প্রকৃতিকে এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। যা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। ফলে এ

অধ্যায় পাঠে রহস্যের মধ্যে বিশেষ সফরের অনুভূতি তৈরি হবে। এতে অন্তর্দৃষ্টির আয়নায় তুলে ধরা হয়েছে প্রাকৃতিক বহুমুখী উপাদানকে। যেমন ফুল, পতঙ্গ, ঘ্রাণ, পরাগায়ন, মাংসাশী উদ্ভিদ, ময়ূর-ময়ূরী, নারী ও পুরুষ পাখি, বিভিন্ন প্রজাতি ও রঙের অবলোকন, শামুকের চোখের রহস্য, হামিং বার্ডের উড়ালভঙ্গি, বিষধর ও নির্বিষ সাপের দাঁত, মানুষের দেহ তৈরির পরমাণু, নাক ও গন্ধ, দেহের শিরা-উপশিরার দৈর্ঘ্য, কিডনির স্থাপনা, মানুষের দেখা স্বপ্ন, চাঁদের আকৃতি, খাবার ও লালা, চিংড়ির নার্ভাস সিস্টেম, হাতি ও বাজপাখির সনাক্তকরণ ক্ষমতা, মানুষ ও পিঁপড়ার ওজন, বর্জ্য ও ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ের বিবরণে লেখকের দার্শনিক মননের স্বাক্ষর রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় শিশিরের সূর্যমুখ। শিরোনাম থেকে বুঝা যাচ্ছে সকালের ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দুর মধ্যে যেভাবে সূর্যের প্রতিভাস হয়, তেমনি এখানে ছোট ছোট বাক্যের শিশিরবিন্দু তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বিশাল সূর্যের প্রতিবিম্ব। এ অধ্যায় মূলত মুসা আল হাফিজের প্রবচননির্ভর। জীবনসত্যে সুদৃঢ় বাণীই প্রবচনে পরিণত হয়। এতে ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট বাক্য বা বাক্যাংশ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার প্রকাশ ঘটায়। স্বতঃস্ফূর্ততা ও জীবনাভিজ্ঞান মুসা আল হাফিজের প্রবচনে লক্ষ করা যায়। যাতে এ প্রকরণে তার সহজ স্বচ্ছন্দ্য প্রমাণিত হয়। কয়েকটি প্রবচন পাঠ করলে তা উপলব্ধি করা যাবে। যেমন :

প্রতিবাদ ভীতুদের থেকে জীবিতদের আলাদা করে দেয়! (উপসংহার)

স্বার্থের নৌকায় চড়ে বন্ধুত্বের নদী পার হওয়া যায় না! (বস্তুত)

তোমার প্রার্থনা পূরণ করা উপরওয়ালার কাজ। কিন্তু প্রার্থনাকে উপরওয়ালার কাছে পৌঁছানো তোমার কাজ। (প্রার্থনা ও দায়)

নিজের বিশ্বাসকে যতটা সন্দেহ না করা উচিত, নিজের উত্তেজনাকে ততটা সন্দেহ করা উচিত! (নীতি)

ঝরে যাওয়া পাতা জানে, গাছের বন্ধন কত জরুরি ! (যৌথতা)

এক হাজার ভাতের আশ্বাস একটি চালকে ভাতে রূপান্তরিত করতে পারে না! (কথা ও বাস্তবতা)

জনপ্রিয়তা সেই স্বর্ণালি পিতল, যাকে পাবার জন্য অনেকেই স্বর্ণ থেকে বঞ্চিত হয়! (বিনষ্টি)

সপ্তম অধ্যায় প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ। প্রশ্নশীলতা ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়ায় এ অধ্যায় রচিত। বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার উৎকর্ষসাধনে বুদ্ধিবৃত্তিক দায় হিসেবে মুসা আল হাফিজ স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসামুখর। জীবনের নানা প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন

হাজির করেছেন এবং জবাব খুঁজেছেন নিজের মধ্যে। এসব প্রশ্ন ও জবাব নিতান্তই প্রাসঙ্গিক ও মহিমাময়।

ওয়ার অ্যান্ড পিচ শিরোনামে মুসা আল হাফিজ লিখেন–

শান্তিকে প্রশ্ন করলাম কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত করেছে?

সে বলল যুদ্ধ।

যুদ্ধের আয়োজকদের প্রশ্ন করলাম কেন তোমরা কালে কালে যুদ্ধের আয়োজন কর?

তারা বলল শান্তির সুরক্ষার জন্য।

ক্ষমতা শিরোনামে তিনি লিখেন–

প্রশ্ন : নির্বোধ ও বুদ্ধিমানের পার্থক্য কী?

উত্তর : নির্বোধরা অন্যের গুণাবলিতে হিংসা ও ঈর্ষায় আটকে রয়। বুদ্ধিমানরা গুণাবলিকে নিজের করে নেয়!

এ অধ্যায়ে লেখক কখনো প্রশ্নকে কুড়িয়ে এনেছেন মানবজাতির জ্ঞানের নানা অধ্যায় থেকে। এর জবাব তালাশ করেছেন সেখানে। ফলে এ অধ্যায়েও ইতিহাসের পায়ের আওয়াজ শুনা যায়। বহু মনীষীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে।

অষ্টম অধ্যায় বোধির পঙ্‌ক্তিমালা। এগারোটি কবিতা আছে এ অধ্যায়ে। সবগুলোই মর্মশিহরনময়। এখানেও তার কবিতা নিজস্ব প্রবণতার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে অটুট। একদিকে তা নান্দনিক সৃষ্টিশীল ও প্রগতি-অনুরুদ্ধ, অপরদিকে ঐতিহ্যলিপ্ত ও আধ্যাত্মিক এইসব কবিতা। এখানে তিনি প্রতিকূল সময়কে তার কাব্যশব্দে বুনে দিয়েছেন অবলীলায়। খবর শিরোনামে তিন পঙ্‌ক্তির মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন আর্ত স্বদেশ ও সমকালকে। এ অধ্যায়ের সবচেয়ে ছোট্ট কবিতা এটি;

খবর !

স্বপ্নের পাম্প থেকে বিনাশের ইঞ্জিনের

জ্বালানি লুণ্ঠনের শব্দে

কম্পমান বাংলাদেশ!

মাত্র এগারোটি কবিতার সঞ্চয়ে দেখা যাচ্ছে সমৃদ্ধ আধার। তুমি, অলংকার, আপন শাসন বা সূর্যরশ্মি কবিতা প্রেম ও চিত্তের চিরায়ত উদ্‌গতির কথাই শুধু বলছে না, সময় ও সমাজের মুখোমুখি হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে। এ অধ্যায়ে পাঠক যেমন গদ্য অতিরিক্ত অন্যতর স্বাদে সিক্ত হবেন, তেমনি প্রবুদ্ধ হবেন আত্মশক্তিতে। পুলকিত সচ্ছলতায়।

নবম অধ্যায় ধুতরার ঝোপ। বড় কোনো জঙ্গল নয়, ঝোপই তৈরি করা হয়েছে এখানে। ঝোপ আবার বুনো ধুতরার। ছোট ছোট বাক্যের প্রহার আছে

এ অধ্যায়ে। সব কয়টির বিন্যাস ধারালো ও অর্থগর্ভী । সমস্ত কথামালা বিভিন্ন শিরোনামে বিভক্ত। যেমন : জয়সূত্র, গতি ও জীবন, শিকার ও শিকারি, যথাস্থান, টাক বনাম ভয়, সংখ্যা ও ক্রিয়া, পানি ও মুমিন, বিচারের আয়না, মূল্য ও যথার্থতা ইত্যাদি। প্রতিটি রচনাই প্রবল আবেদনে ঋদ্ধ। যেমন :

যদি আমি সকালের কথা বলি, তাহলে পাখির কথা বলছি। যদি আমি পাখির কথা বলি, তাহলে প্রকৃতির আত্মার কথা বলছি। যদি আমি প্রকৃতির আত্মার কথা বলি, তাহলে নিজের হৃদস্পন্দনের কথা বলছি। যদি আমি নিজের হৃৎস্পন্দনের কথা বলি, তাহলে তোমার কথা বলছি! (মনের অধিবাসী)

সে স্ট্যাটাস দিল মক্কায় যাবে। কিন্তু কত দূরের পথ ...

তাকে বললাম, বাড়ির কাছের মসজিদের সাথে তোমার দূরত্ব কমাও। দূরবর্তী মক্কার দূরত্ব কমে যাবে! (নাগালের কাজ)

নিজের অপরাধের উপর হাসতে থাকার মানে হলো কাঁদতে কাঁদতে বিপন্ন হবার দিন আসন্ন।

নিজের অপরাধের উপর কাঁদতে থাকার মানে হলো হাসতে হাসতে পরিশুদ্ধিকে বরণ করার দিন আসন্ন। (অপরাধ ও আগামীকাল)

দশম অধ্যায় কথিকাধর্মী কিছু রচনার সমাহার। এতে রচনার বিষয় হচ্ছে সুফিবাদ, কুরআন ও প্রাচ্যবাদ, জ্ঞানতত্ত্ব, তারুণ্য ও জ্ঞানচর্চা, আল মাহমুদের কদর রাত্রির প্রার্থনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলাম ও দার্শনিক মতামতের সম্পর্কের সারকথা এবং ইবনে সিনার হাওয়া বিশ্লেষণ। এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো বিচিত্র বয়ন। আসলে এখানে বহু রঙের ও বহু বিষয়ের সমাহার হলেও বয়ন হয়েছে যত্নশীল। ফলে বৈচিত্র্যের মজা পেয়েও পাঠক জ্ঞান ও চিন্তার একটি সংহতির মধ্যে অবস্থান করেই গ্রন্থটির পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পুরো কেতাব চিন্তাশীল মননের অভিসার। চিন্তা-ভাবনাকে উন্নত করা এবং মানুষ হিসেবে ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশকে ত্বরান্বিত করার আকাঙ্ক্ষা আছে লেখকের। এ কেতাব বিভিন্ন কালের শিক্ষা ও চিন্তারসদে ভরপুর। তবে এর প্রায়োগিকতা উত্তরাধুনিক দুনিয়ায়ও সমান প্রাসঙ্গিক। লেখক তার কালচেতনাকে চলমান সময়ের পটে স্থাপন করেও সর্বকালীন জ্ঞানের নানা উপাদানকে আলিঙ্গন করেছেন। নতুনের পেয়ালায় এনেছেন প্রাচীন পানীয়। এরই নাম দিয়েছেন উত্তরাধুনিক শরাব।

জীবনকে আমরা যতটা ব্যাখ্যা করতে পারছি, তার চেয়ে অনেক দ্রুততার সাথে জীবনের বিকাশ হচ্ছে। ফলে জীবনের অসংখ্য হেকমত এমন আছে, যার নাগাল আমরা পাইনি। এজন্য সেইসব চিন্তাবিদের চিন্তা চর্চা প্রাত্যহিক প্রয়োজন, যারা জগতের বস্তু ও অবস্তুতে ছড়িয়ে থাকা দরকারি শিক্ষা ও রহস্যসমূহকে অলিখিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করবেন না। যদিও সব রহস্য ও শিক্ষা লিখে ফেলার সাধ্য কারো নেই। তবুও চিন্তা ও প্রজ্ঞার পথের পথিকরা পথচলায় ক্লান্ত হতে নারাজ। এরকম নারাজি থেকেই সুন্দর সুন্দর সৃষ্টিকর্মের জন্ম হয়। উত্তরাধুনিক শরাব গ্রন্থটি এই সিলসিলার উজ্জ্বল ও অসাধারণ সংযোজন।

১০ মে, ২০২৩
৪৪১, ৩/ক, মিরপুর ১০
ঢাকা

গল্পের আমসত্ত্ব

গরুবিষয়ক

তার বাবা গরুর রাখালি করতেন। লোকেরা তাকে বলত রাখালপুত্র। এ নিয়ে খুব কষ্ট তার। অনেক অর্থ, জমি ও প্রতিপত্তি হয়েছে রাখালপুত্রের। লোকেরা এখন তাকে বলবে জমিদার! কিন্তু বলছে কী?

লোকটি ভাবল অনেক গরু কিনবে। গরুদের থাকবে অনেক রাখাল। সে হবে গরুর মালিক, রাখালের মালিক। কেউ আর ভাবতেও পারবে না, সে রাখালপুত্র!

সে অনেক গরুর মালিক হলো। এ তল্লাটে তার গরু সবচেয়ে বেশি। তবুও এলাকার সব সুন্দর সুন্দর গরুর মালিক হবার খায়েশ তার। অনেক টাকা খরচ করল। এলাকার প্রায় বড় বড় সব গরুই কিনে নিল। যে গরু সে কিনতে চায়, মালিককে বিক্রি করতেই হয়। নতুবা বিপদে পড়ার ভয়!

লোকটি চারধারে খোঁজ করে। কোন এলাকায় বড় গরু পাওয়া যাবে সস্তায়! যেখানেই সস্তায় গরু মিলে, লোকটি হাজির। অনেক গরু কিনে সে, সেগুলোর অনেক রাখাল। অনেক জমি আছে তার। এবার মানুষ তাকে আর গরু রাখালের পুত্র বলার ধৃষ্টতা দেখাবে না। লোকটি মনে মনে খুশি হয়। সে আরো গরু কিনে হাজার হাজার গরুর মালিক হয়ে যায়। তার বাড়ি পরিচিত হয়ে যায় গরুওয়ালার বাড়ি হিসেবে!

এক বিকেলে হাতির উপর সওয়ার হয়ে লোকটি যাচ্ছিল বাজারে। পথের ধারে বালকেরা বলাবলি করছিল এই যান গরুওয়ালা জমিদার!

লোকটি তা শুনে বজ্রাহত হলো। সে তো গরুর সাথে নিজের সম্বন্ধকে ভুলিয়ে দেবার জন্য এতকিছু করেছে! কিন্তু লোকেরা এখন তাকে জমিদার বলছে বটে, কিন্তু আগে উল্লেখ করছে গরুর কথা!

লোকটি বাড়িতে ফিরে সব গরু বিক্রির ঘোষণা দিল! সে বুঝতে পারল গরু দিয়ে গরুর গন্ধ দূর করা যায় না। এর জন্য খুঁজতে হবে অন্য পথ।

সে ভাবল আর ভাবল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

একদা গভীর ঘুমে স্বপ্নে কেউ তাকে প্রশ্ন করল কীসের তালাশে তুমি এত পেরেশান? লোকটি বলল মানুষ আমাকে গরুর সাথে সম্বন্ধিত করে। আমি চাই এ থেকে মুক্তি।

স্বপ্নলোকের মানুষটি তাকে বললেন, মুক্তি তুমি অনেক আগেই পেতে। কিন্তু সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তোমাকে মুক্তি পেতে দেয়নি।

এ আকাঙ্ক্ষার গরুকেও বিক্রি করে দাও।

দরবেশি রূপকথা

কী ঝড়! গাছের মাথাগুলো ভেঙে-মচকে ছিটকে পড়ছে। বজ্রপাত হচ্ছে মাতালের আক্রোশে। এরই মধ্যে কয়েকজন পথিক অন্ধকার উজিয়ে বাড়ি ফিরছিল। টিনের চাল উড়িয়ে নেওয়া বাতাস তাদের এগুতে দিচ্ছিল না। তাদের দরকার ছিল আশ্রয়। কিন্তু আশ্রয়ের নাম নিশানা তো নেই কোথাও। চারদিকে নিরাশার মতো ঝোপঝাড় আর দমকা হাওয়ার দাপাদাপি। হঠাৎ উঁচু পাহাড়ের কাছে চোখে পড়ল এক প্রাচীন উপাসনালয়। সেখানে ঢুকে পড়ল ভয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলা পথিকরা। তারা অপেক্ষা করছিল যেন ঝড়টা থামে। কিন্তু থামবে কোথায়, বেড়েই চলছিল বাতাসের বুক চাপড়ানি। কয়েকটি পেঁচা উপাসনালয়ের ছাদে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের উপস্থিতি ভয়ের উপরে আরো ভয় বাড়িয়ে তুলল। তারা অশুভের প্রতীক। তাদের তাড়ানো হলো। সেই সাপদেরও মারা হলো, যারা পরিত্যক্ত উপাসনালয়ের গোপন গর্ত থেকে মুখ বের করেছিল। প্রহরের পর প্রহর চলে যাচ্ছে। লোকেরা প্রার্থনা শুরু করল। ঝড়টা থামাও হে প্রভু! কিন্তু কাছেই কোথাও যেন আছড়ে পড়ল বৃক্ষের ভাঙা ডাল-পালা।

লোকেরা চিন্তা করছিল, ঈশ্বর কেন তাদের প্রার্থনা শুনছেন না? তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেনি। তারা ভাবল, ও ঈশ্বরপরিত্যক্ত। হয়তো তার কারণে ঈশ্বর তাদের ডাকে সাড়া দেননি। তারা তাকে বের করে দিল উপাসনালয় থেকে।

কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। প্রকাণ্ড এক বজ্রপাতে ভেঙে গেল উপাসনালয়টি!

কাক ও শালিক

গল্পটি শুধু একপাল কাকের নয়, কয়েকটি শালিকেরও!

ঢাকা শহরে কাকরাই প্রধান পাখি। সন্ধের আকাশকে কালো করে তারা নিজেদের রাজত্বের প্রচ্ছদ এঁকে আসন্ন রাত্রিকে স্বাগত জানায়। ঢাকার প্রতিটি সকাল তাদের আধিপত্যের তারস্বর শুনতে শুনতে দুপুরের দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হয়!

সায়েদাবাদের ধারে, জনপথ মোড়ে কাকদের কলোনির পাশে থাকত একটি শালিক পরিবার। তাদের উপস্থিতি ও জীবনযাপন কাকদের ভীষণ নাপছন্দ। কিন্তু শালিকের মাংস কাকের বেশ পছন্দ!

এলাকাটি গাড়ির শব্দে, ধুলো ও ধোঁয়ায় ঢেকে থাকে। কাকরা এজন্য দায়ী করে শালিকদের উপস্থিতিকে। কারণ তারা সাধারণত কীটপতঙ্গ, ফল, দানাশস্য ও ফুলের নির্যাস খায়। এ কারণেই পরিবেশ দূষণ হয়। যা কাকদের শান্তি নষ্ট করে। জীবনকে কঠিন করে তোলে। শালিকদের তারা বলে দিয়েছে, কীভাবে তারা এই এলাকার আপদের কারণ হয়ে উঠেছে!

একদিন এক দালানের ছাদে বালক বালিকারা হত্যা করল দুটি কাক। এর দায় চাপল শালিকদের ঘাড়ে। কারণ এরা সাধারণত গাছের খোড়ল এবং দালানের ফোকরে বাসা বানায়। যার ফলে লোকেরা বিরক্ত হয়ে কাক হত্যা করছে! আরেকদিন আবর্জনার ভাগাড় স্থানান্তরিত করল সিটি কর্পোরেশন। কাকদের খাদ্যের জোগান কমে গেল। এজন্যও দায়ী করা হলো শালিকদের। কারণ শালিকদের আকার মাঝারি, লেজ খাটো এবং ঠোঁট সোজা, সরু ও কিছুটা লম্বা। এই আকার কারো পছন্দ নয়। এদের খাবার দিতেও কেউ প্রস্তুত থাকে না। ফলে খাবারের মজুদ সরানো হয়েছে। কিন্তু শালিকদের অসুন্দর আকারের কারণে কষ্ট করতে হচ্ছে কাক, কুকুরসহ অনেককেই। এই যন্ত্রণা আর কত?

কাকেরা এখানকার শাসক। এলাকার সকল জটিলতা নিরসনের দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। ফলে জটিলতার জন্য দায়ী শালিকদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হয়। কাকগুলো খুব দয়ালু। তারা শালিকদের শাস্তি দিচ্ছে না। বরং তাদেরকে সভ্যতা, মানবতা, আইন ইত্যাদি শেখাতে চায়। সেই উদ্দেশ্য ঘোষণা করে কাকেরা ধরে আনল শালিকদের। দুই দিন রাখা হলো বিনা খাবারে। ভয়ে ও ক্ষুধায় তারা কাঁদতে থাকল। রাজা কাক সিদ্ধান্ত নিল ক্ষুধা ও কান্না থেকে তাদের মুক্তি দেবার জন্য তাদের খেয়ে ফেলা হোক।

কয়েকদিন গেল। এলাকার পাখিরা শালিকদের তো খুঁজে পায় না। সবাই জানে, কাকেরা তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ধরে নিয়ে গেছে। তারা কাকদের কাছে দাবি জানাল শালিকদের ফিরিয়ে দাও! কাকেরা বলল দেখো, ওদের আমরা শেখাতে চেয়েছিলাম আইন। কিন্তু শিখবে কোথায়? ক্ষুধা সমস্যায় ওরা হয়ে গেল মরণাপন্ন। কান্না ছাড়া ওদের কিছুই করার ছিল না। আমরা ওদেরকে সাবাড় করে এলাকার সবার সমস্যা যেমন দূর করেছি, তেমনি সংকট থেকে তাদেরও মুক্তি দিয়েছি!

স্মৃতি

কক্সবাজার হয়তো তোমাকে ডাকছে। বন্ধুদের সাথে হয়তো ভ্রমণে যাচ্ছ। সাগর যখন পাগলামি করবে, তখন তোমরা উপভোগ করতে চাও!

যখন একের পর এক ঢেউ আসছিল গর্জন করে করে, তখন তোমাদের সবচেয়ে উদ্যমী সাথিটি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। তুমি তাকে হাত ধরে আটকালে। সে বিরক্ত হলো। আরেক ঢেউয়ে সে ঝাঁপ দিতে চাইল। তুমি টেনে ধরলে তাকে। সে ক্রুদ্ধ হলো। সে সাঁতারে তেমন পটু ছিল না। আরেকবার যখন সমুদ্রে সে ভাসতে চাইল, তুমি টেনে ধরতেই বন্ধুটি তোমাকে লাথি মারল সজোরে!

তুমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলে না। বালুবেলায় লিখে রেখেছিলে সেই ঘটনা।

বন্ধুরা সাগরে ঝাঁপ দিল। কেউ কাউকে আটকাচ্ছে না।

হঠাৎ এক ঢেউ তোমাদের কয়েকজনকে ভাসিয়ে নিতে লাগল। তুমি ভাসছিলে আর ডুবছিলে। ধীরে ধীরে হারাচ্ছিলে ফিরে আসার শক্তি।

এক বন্ধু প্রবল ঢেউয়ের হাত থেকে তোমাকে টেনে নিল। ঘটনাটি তুমি লিখে রাখলে ডায়েরিতে।

সেদিনের দুটি ঘটনাই তুমি লিখেছ।

এক বন্ধু লক্ষ করেছিল তা। সে তোমাকে প্রশ্ন করল, উভয় ঘটনাই তুমি লিখেছ। কিন্তু একটি বালুবেলায়, আরেকটি ডায়েরিতে। কেন?

তুমি তাকে জবাবে বলবে "যখন কেউ আমাদের আঘাত করে, তাকে বালিতেই লিখে রাখা উচিত। যেন ক্ষমার পানি তাকে ধুয়ে নিতে পারে। কিন্তু যখন কেউ সাহায্য করে, তাকে অক্ষয় কালিতে লিখে রাখা উচিত। যাতে আমি মরে গেলেও এর স্মৃতি জীবিত থাকে!"